

নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

অনীক মাহমুদ

এক.

‘বিচ্ছিন্নতা’ শব্দটি দার্শনিকতত্ত্বের আবহ থেকে বেরিয়ে আজ সফলভাবে সাহিত্যেও ব্যবহৃত হচ্ছে। রুশো থেকে শুরু করে হেগেল - কার্লমার্কস প্রমুখ মনীষী বিচ্ছিন্নতা বা Alienation নিয়ে ভেবেছেন - মতামত দিয়েছেন। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বহুহীন অবস্থান কিভাবে মানুষকে পণ্যজ্ঞান করে এবং পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় সে সম্পর্কে কার্লমার্কস (১৮১৮-৮৩) বলেছেন:

বুর্জোয়াশ্রেণী যেখানেই প্রাধান্য পেয়েছে সেখানেই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক, গোষ্ঠীগত এবং রাখালিয়া সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে। লোকের ব্যক্তিমূল্যকে এরা বিনিময় মূল্যে পরিণত করেছে আর অগণিত অনস্বীকার্য সনদাবদ্ধ স্বাধীনতার স্থানে এরা খাড়া করেছে ওই একটিমাত্র স্বাধীনতা - অবাধ বাণিজ্য যাতে বিবেকের স্থান নেই।^১

A-6097

আসলে মানুষ প্রাণিবিশ্বে অন্যান্য জীবের তুলনায় যেমন শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে তেমনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থপরতার ক্ষেত্রেও তার স্থান সবার উপরে। প্রাণীদের মধ্যে পিপীলিকা, মৌমাছি, বল্লিক এরা যুগ যুগ ধরে একের পেছনে অন্যের সহগমনের মাধ্যমে নিজেদের শ্রমশক্তি কাজে লাগায়। কিন্তু মানুষের মধ্যে স্বাধীনচিন্তা এবং আত্মসুখকামী প্রত্যয় বেশি বলেই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করেও তারা ব্যক্তিসত্তার পূজা করে বেশি। এর ফলে আদিম সাম্যবাদী সমাজ ভেঙে গেছে। ক্রমশ দাস, সামন্ত পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী সমাজের অভ্যুদয় ঘটেছে। মানুষের চাওয়া পাওয়া ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যচিন্তা যতবেশি ঘনীভূত হয়েছে যতবেশি সমষ্টিচিন্তা নিগৃহীত এবং ব্যক্তিচিন্তা গৃহীত হয়েছে ততবেশি প্রতিযোগিতা বেড়েছে। টিকে থাকবার সংগ্রাম আর অধিকার আদায়ের মাত্রা বর্ধিত হয়েছে। পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা সবসময় জন্ম দেয় প্রতিযোগিতার। যেহেতু পুঁজি সবসময়ই লাভালাভের ব্যাপারটি শুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে সেহেতু মানুষের জীবনচরণ, প্রেম, প্রীতি, বাৎসল্য, দাক্ষিণ্য কিছুই টাকার উপরে উঠতে পারে না। কাজেই প্রতিযোগিতা ও শ্রেণীবিভাগ সমাজে বৃদ্ধি পেলে বিচ্ছিন্নতাও বেড়ে যায়। এ প্রসঙ্গেও কার্লমার্কস বলেছেন: ‘প্রতিযোগিতা বিভিন্ন ব্যক্তিমানুষকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, বুর্জোয়াদেরই শুধু নয়, আরও বেশি পরিমাণে শ্রমিকদের’।^২ পুঁজিবাদী সমাজে কেউ কাউকে লালন করতে চায় না। সাধারণত

সাহিত্যিকী

অন্যের প্রতি নজর দেবার সময় এবং ইচ্ছা এ সমাজের অধিবাসীদের থাকেনা। ফলে ব্যক্তি যেটা হতে চায়, পেতে চায় সে বিষয়ে কারও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। ব্যক্তির এই অপূর্ণতা, না পাওয়া বা না হওয়ার বেদনা ক্রমশ তাকে হতাশাগ্রস্ত করে। হতাশা থেকে একাকীত্ব, বিষণ্ণতা, বিচ্ছিন্নতা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা প্রবণতার জন্ম দেয়। কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈশ্যরূপ সহ্য করতে পারেন নি। যুগের হতাশা, কুশ্রীতা, ইতরতার প্রতি চরম ঘৃণা নিষ্ক্ষেপ করে কেউ কেউ জীবন থেকেও বিদায় নিয়েছেন।^৩ নিজদেশের বৈশ্য সমাজ-সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করে অনেকেই হয়েছেন দেশান্তরিত।^৪ ধনতন্ত্র দিয়েছে ভয়ঙ্কর এবং ক্ষয়ঙ্কর যুগের সংবেদ। টি.এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) এই অপ্রেমী ইউরোপকে দেখেছিলেন পোড়োভূমির অবয়বে। লণ্ডন শহরকে তাঁর মনে হয়েছিল Unreal City। এর মানুষগুলোকে মনে হয়েছে ফাঁপা। তিরিশের দশকে জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), বুদ্ধদেব বসু ((১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২), সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) এর মধ্যে এ যুগজুর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ইউরোপের নগর লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, ভিয়েনা, মস্কো, প্রাগ কিংবা আমেরিকার নিয়র্ক, শিকাগো যে শিল্প আর পুঁজির প্রাচুর্যে শোষণদণ্ডের উন্মার্গ এবং নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে ইংরেজদের উপনিবেশবাদের থাবায় কলকাতায় সে তরঙ্গের ঢেউ ফেনায়িত হয়। এই শহরের কবি বিষ্ণু দে উচ্চারণ করেন:

মানুষের অরণ্যের মাঝে আমি বিদেশী পথিক,
মুখোমুখি কথা বলি চোখে লাগে অটল প্রাচীর,
বিদেশী পথিক আমি এসেছি কি বিধাতার ভুলে
পৃথিবীর সভাগৃহে, বুঝি নাকো ভাষা যে এদের।^৫

কবি জীবনানন্দ দাশ লিখেছেন:

সকল লোকের মাঝে বসে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা
আমার চোখেই শুধু ধাঁধা
আমার পথেই শুধু বাধা।^৬

নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

কারণ মানুষের হৃদয় আর শাস্ত্রত হৃদয় নেই। শাস্ত্রত মূল্যবোধের দীপ্তি থেকে বিদায় নিয়েছে হৃদয়ের পেলবতা:

চোখে কালোশিরার অসুখ
কানে যেই বধিরতা আছে
যে কুঁজ গলগও মাংসে ফলিয়াছে
নষ্টশসা - পচা চালকুমড়ার ছাঁচে
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে-।^৭

প্রেমময়ী নারীদের যখন মনে হয় 'সব বাসি সব বাসি একেবারে মেকি।' কবির মানুষ সম্পর্কে যখন ধারণা জন্মে:

তবুও জল্পগলো আনুপূর্ব অতিবৈতনিক
বহুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।^৮

যখন দেখেন পৃথিবীব্যাপী অদ্ভুত আঁধারের ছড়াছড়ি, মিথ্যাবাজ, অসত্য ভণ্ডদের পোয়াবারো অবস্থা, তখনই তাঁর বনহংস হতে ইচ্ছে করে। কারণ পরাজয়ের গ্রানি আর লাঞ্ছনার ভেতরে থেকে খণ্ড খণ্ড ভাবে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে শিকারীর গুলিতে প্রাণ দেয়া ভালো। রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্যধারায় বিচ্ছিন্নতার বহুমুখী ব্যবহার জীবনানন্দের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ভাবে উপলব্ধিতে-চরণে এমনকি শব্দব্যবহারেও তাঁর বিচ্ছিন্নতাবোধ ক্রিয়াশীল। বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের উপায়ও তিনি খুঁজেছিলেন মানবিকতার উত্তরণের মধ্যে। কবি বিষ্ণু দে তাঁর বিচ্ছিন্নতা অতিক্রমের পথ পেয়েছিলেন মার্কসবাদের সাধনায়। কাজেই পুঁজিবাদ মানবসমাজে যে ভোগ এবং দুর্ভোগের জন্ম দিয়ে যুগপৎ প্রাচুর্য ও নিঃস্বতার সৃষ্টি করে মানবিক মূল্যবোধে উদ্ভিক্ত শিল্পীরা স্বভাবতই দ্বিতীয় ধারার পক্ষ নিয়ে কখনো লড়াই করেন কখনো বা নিজের তৈরি জগতের মধ্যে নিমগ্ন হন। পুঁজিতন্ত্রের হিংস্রতায় সৃষ্ট বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ উপলব্ধি করে মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

মানুষের দেবতা মানুষের মনের মানুষ। জ্ঞানে কর্মে ভাবে যে পরিমাণে সত্য হই সেই পরিমাণে সেই মনের মানুষকে পাই। অন্তরে বিকার ঘটলে সেই আমার আপন মনের মানুষকে দেখতে পাইনে। মানুষের যত দুর্গতি আছে সেই আপন মনের মানুষকে হারিয়ে। তাকে বাইরের উপকরণে খুঁজতে গিয়ে, অর্থাৎ আপনাকেই পর করে দিয়ে। আপনাকে তখন টাকায় দেখি, ভোগের আয়োজনে দেখি। এই নিয়েই তো মানুষের যত বিবাদ যত কান্না।^৯

দুই.

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ত্রিশোত্তর যুগে বাংলা সাহিত্য সাধনায় আবির্ভূত হয়েছিলেন! কিন্তু যে অর্থে ত্রিশোত্তর কালের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা, নজরুলের সাধনা সেখানে ভিন্নমুখী ছিল। ভাবে-ভাষায়-প্রকরণে রবীন্দ্রবিরোধী কাব্যচেতনা ছিল এ ধারার কবিদের অনিষ্ট। সে ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্দীন রবীন্দ্রধারার মধ্য থেকেই নিজেদের স্বতন্ত্র ও কবিত্বের পথ নির্মাণ করেছেন। বলাবাহুল্য রবীন্দ্রধারার ভেতরে থেকে নিজের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করলেও নজরুলের মধ্যে যুগধর্ম ও সমকালমনস্কতা প্রবল ছিল। তৎকালীন সমাজে মানুষে মানুষে হানাহানি, বিদ্বেষ, শোষণ-বঞ্চনা, উৎপীড়িতের মর্মবেদনা তিনি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সময়ে ব্রিটিশ বেনিয়া শাসককুল পুঁজিবাদী কায়দায় ভারতবর্ষের মানুষদের শোষণ-শাসনে ন্যুজ করেছে, অন্যদিকে তাদের দোসর দেশীয় জমিদার, মহাজন, মুৎসুদ্দি, ধর্মব্যবসায়ীরা সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদী কৌশলে এতদ্দেশীয় সাধারণ মানুষদের নিঃস্ব করেছে। মৌলিক চাহিদা পূরণ না হবার ফলে এদেশের কৃষক-শ্রমিক-মজুর-মুটে-কুলি জেলে এই অবহেলিত মানুষরা সুস্থজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। জমিদার, মহাজনদের অত্যাচারে বাস্তবায়িত থেকে উচ্ছেদ হয়ে কেউ কেউ লোটাকম্বল সম্বল করে পথে এসে দাঁড়িয়েছে। নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধের কয়েকটি পরিসর রয়েছে। এক, যারা সামন্তবাদ এবং পুঁজিবাদী শোষণ-বঞ্চনায় সুস্থ মানবিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি কবির মমত্ব ও সহানুভূতির প্রকাশ এবং এই অপঘাত থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য উদ্দীপনা সৃষ্টিরও প্রয়াস রয়েছে। দুই, বিচ্ছিন্নতার সৃজক ধনবাদী, গণবিরোধী ও শোষণ-বঞ্চনার হোতা যারা তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্যোতনা রয়েছে নজরুল-সাহিত্যে। তিন, কবির ভাবে ও মননে বিচ্ছিন্নতা। চার, কথাসাহিত্য ও নাটকের সৃষ্ট চরিত্রে বিচ্ছিন্নতাবোধ।

কাজী নজরুল ইসলাম ১৯২০ এর দশকের শুরু থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সংগঠক ও নেতা কমরেড মুজফ্ফর আহমদের সংস্পর্শে আসেন। তার আগে ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে থাকাকালীন সেন্সরের বেড়া ডিঙিয়ে তাঁর হাতে রুশ বিপ্লবের নিষিদ্ধ সাহিত্য এসেছিল। ১৯২০ সালে নবযুগ পত্রিকায় প্রকাশিত “ধর্মঘট” প্রবন্ধ ও ১৯২৬ সালের আগস্ট মাসে আত্মশক্তি পত্রিকায় “গণবাণী ও মুজফ্ফর আহমদ” শীর্ষক পত্র, নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল, গণবাণী পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং কৃষকসম্মেলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হই যে, নজরুল শ্রমজীবী মানুষদের

নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

দারিদ্র্য ও শোষণবঞ্চনা থেকে মুক্ত করবার জন্য রুশবিপ্লব ও মার্কসীয় ধ্যানধারণার সংস্পর্শে এসেছিলেন। শুরু থেকেই তিনি ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের জীবনে নিপতিত দুঃখ দুর্দশার কারণ নির্ণয় করেন। এটা হচ্ছে ভারতীয়দের স্বাধীনতাহীনতার সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের নির্মম শোষণ। ব্রিটিশ শোষণকে যারা পাকাপোক্ত করে নিজেদের প্রাচুর্য বৃদ্ধি করেছে তারা জমিদার, মহাজন, মজুতদার। এদেশের শোষণ নাগপাশে আবদ্ধ কৃষক-শ্রমিক-মজুর-মুটে-জেলে-তাঁতি সবাই মৌলিক চাহিদাবঞ্চিত। আর অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসা বাসস্থানের মত মানবিক অধিকার থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করলে সে আর মানুষ থাকে না। নজরুল এসব মানুষের জীবনে আপতিত অমানবিক বঞ্চনার কথা লিখলেন:

- ক. অন্ন স্বাস্থ্য প্রাণ, আশা, ভাষা, হারিয়ে সকল কিছ,
দেউলিয়া হয়ে চলেছে মানব ধ্বংসের পিছু পিছু।
পালাবার পথ নাই,
দিকে দিকে আভ অর্থ পিশাচ ঝুঁড়িয়াছে গড় খাই।^{১০}
- খ. আগুন জ্বলেনা মাসে কতদিন হয় ক্ষুধিতের ঘরে,
ক্ষুধার আগুনে জ্বলে কত প্রাণ তিলে তিলে যায় মরে।
বোঝেনা ধনিক হোক সে হিন্দু, হোক সে মুসলমান
আল্লাহ যাদের নিয়ামত দেন পাষণ্ড তাদের প্রাণ।^{১১}

মানুষের জীবনের এই দুর্ভাগ্য ও অশনিপাতের মূলকারণ পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ। নজরুল পুঁজিবাদের হোতাদের চিত্র এঁকেছেন নির্ভীক ভাবে:

- রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমিট রক্ত ইটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশকরি কোটি ভিটে।
দিব্য পেতেছ খল কলওয়ালা মানুষ পেমানো কল,
আখ পেমা হয়ে বাহির হতেছে ভুখারী মানব দল।
কোটিমানুষের মনুষ্যত্ব নিজাড়াইয়া কলওয়ালা,
ভরিছে তাহার মদিরা পাত্র পুরিছে স্বর্ণজ্বালা।
বিপ্লবের অন্ন ঠাসিয়া ফোলে মহাজন ভুড়ি,
নিরপ্লবের ভিটে নাশ করে জমিদার চড়ে ছুড়ি।
পেতেছে বিশ্বে বণিক বৈশ্য অর্থ বেশ্যালয়,
নীচে সেথা পাপ - শয়তান সাকী গাহে যক্ষের জয়।^{১২}

সাহিত্যিকী

শোষকশ্রেণী সংখ্যায় কম। নজরুলের ভাষায় 'দেড়শত কোটি মানুষের ঘাড়ে চড়ে দেড়শত চোর'।^{১৩} কিংবা

ওরে সগু লক্ষ শির মোদের ডাই
চৌদ্ধ লক্ষ বাহু,
ওরে গ্রাস করেছে তাদের ডাই আজ
চৌদ্ধ জনা রাহু।^{১৪}

যে ব্রিটিশ বেনিয়াশাসকদের নজরুল দস্যুদল, লণ্ঠনকারী দাগাবাজ বলেছেন তাদের রক্তবে কে? শোষণের মোড়কে আচ্ছন্ন শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ তো বিচ্ছিন্ন। তাদের মধ্যে ধর্ম-বর্ণ ছোটখাট স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বান্দ্বিকতার বিষবাম্প শোষকশ্রেণীই তো ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই ধর্মীয় ভেদাঙ্গানে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন মানুষদের লক্ষ্য করে কবি লেখেন:

ক. হুঁকো জল আর ডাতের হাড়ি ডাবলি তাতে জাতির মান,
তাইতো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশ খান।^{১৫}
খ. আজো তারা ক্রীতদাস, আলো বন্ধকর
শৃঙ্খল বন্ধনে দেব! আজো পরস্পর
করে তারা হানাহানি, ঈর্ষা-অশ্রু যুঝি
ছিটায় মনের কালি-নিরন্তর পুঁজি!^{১৬}
গ. এক ঘর ছাড়ি আর ঘরে যেতে নারি,
মর্দ জাতি হয়ে আছে পর্দা ঘেরা নারী।
এ লাঞ্ছনা এ পীড়ন এ আত্মকলহ
আত্মসুখ পরায়ণ পরাবৃতি মোহ।^{১৭}

হিন্দু-মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষ, বিচ্ছিন্নতা অতিক্রমের আহবান জানিয়েছেন নজরুল। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে এককভাবে কিছু করা সম্ভব নয় বলেই হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি কামনায় তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নজরুলের আহবান ছিল:

শত্রু যখন যায় পরে পরে নিজের গল্গ বাগিয়ে নিসু
ভুলে যা ঘরোয়া ধন্দু রিষ। .
কলহ করার পাইব সময়
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয়!
হাতে হাত রাখ, ফেল হাতিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা বিষ
নব ভারতের এই আশিস।^{১৮}

এরূপ আরো দৃষ্টান্ত মিলবে। তাঁর সাহিত্যের সিংহভাগ জুড়ে পুঁজিবাদী বিচ্ছিন্নতার আময় সৃজক ব্রিটিশ উপনিবেশবাদী শাসকদের মুখোশ ও ভণ্ডামি খুলে দেবার প্রয়াস রয়েছে।

নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

পাশাপাশি শোষিত ও বিচ্ছিন্ন জনতার দুঃখ ও দুর্দশার কথা তিনি দরদের সঙ্গে লিখেছেন। এই ব্যবচ্ছেদ থেকে পরিত্রাণের উপায় হচ্ছে প্রচণ্ড প্রতিবাদ এবং সেটা করতে হবে সম্মিলিতভাবে। নজরুল সে জন্য ধর্মভিত্তিক বিচ্ছিন্ন মানুষদের একই ছায়াধ্বলে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন – আহবান জানিয়েছেন।

তিন.

নজরুল-সাহিত্যে শ্লোগানধর্মিতা যত বেশি মননধর্মিতা তত কম। তবু তাঁর বোধে ও মননে নানা সময় অনবয় বা বিচ্ছিন্নতা লক্ষণীয়। ত্রিশের কবিদের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কবিস্বভাবের জটিলতা, ভাব ও মননের বৈপরীত্য প্রধান ছিল। তাঁদের নিঃসঙ্গতা, একাকীত্বের ব্যক্তিক ব্যঞ্জনাই বেশি। নজরুল-সাহিত্যে প্রকাশিত কবির ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতাও কম নয়। কৈশোরে যিনি পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বোহেমীয় জীবনের পথ ধরেছিলেন, যৌবনে সংসারধর্মে প্রবেশ করেও ছন্নছাড়ার অধিবাস বর্জন করতে পারেননি, কখনো কলকাতা, কখনো হুগলি, কৃষ্ণনগরে বৃত্ত হয়েছেন। তাঁর মনে বিচ্ছিন্নতার উপলব্ধি থাকা স্বাভাবিক। সর্বোপরি অনিশ্চিত পেশা এবং জীবন-জীবিকার তাড়না তাঁর চিন্তা ও মননে অনিকেত স্বভাবের জন্ম দিয়েছিল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আবহ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, এককালের বিপ্লবী যোদ্ধারা শেষে স্থবির হয়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করেছেন। বিপ্লবীমত্রে মুক্তি না আসায় আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে অন্তর্লীন হওয়াই অরবিন্দের মত মনীষীরা শ্রেয় মনে করেছেন। নজরুল প্রথম জীবনে সন্তাসবাদের রক্তিম চেতনায় উদ্ভিষ্ট হন। শ্রী অরবিন্দের ভ্রাতা বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের নামে কবির অগ্নিবীণা কাব্যটি উৎসর্গ করা হয়। ধূমকেতু পত্রিকায় বারীন্দ্র কুমার ঘোষের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। এতে তিনি নজরুলকে গরম গরম লিখে জেলে না যাবার পরামর্শ দেন। তখন তিনি মাদ্রাজে অধ্যাত্ম সাধনায় রত ছিলেন। নজরুল অবশ্যি তাঁর পরামর্শ শোনেননি। তিনি গরম গরম লিখে ১৯২৩ সালেই জেলে যান ১৯২৫ সালে সাম্যবাদী, সর্বহারা ও লাঙলের যুগে নজরুল মার্কসীয় জীবনবীক্ষণে উদ্ভিষ্ট হন। এরপর তাঁর মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন ও উন্মাদনা স্তিমিত হয়ে আসে। কবির কৃষ্ণনগর বাসের মধ্যে অসুস্থতা ও দারিদ্র্য চরম আকার ধারণ করে। এ সময়ই তিনি গজল লেখা শুরু করেন। এসময় সর্বহারা, রুদ্রমঙ্গল, সঙ্কিতা, ফণিমনসা প্রভৃতি গ্রন্থের জন্য মাঝে মধ্যে পুলিশি হয়রানিরও তাঁকে ভোগ করতে হয়। ১৯৩০ সালের পর তিনি পুরোপুরি সুরের জগতে নিবদ্ধ হন এবং ১৯৪২ সালে বাকরুদ্ধ হয়ে যাবার পূর্বপর্যন্ত সঙ্গীত সাধনায় রত ছিলেন। নজরুলের সাহিত্যসাধনার বাঁকগুলো লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এক একটি প্রবণতার প্রতি কিভাবে তিনি অনুরক্ত হয়েছেন এবং পুরনো প্রবণতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুন

সাহিত্যিকী

প্রবণতার জন্ম দিয়েছেন। কবির এই মানস প্রবণতার মধ্যেই ছিল বিচ্ছিন্নতার বীজ। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদকে লিখিত একটি পত্রে নিজের সম্পর্কে কবি বলেছেন: 'অতটা হিসেব নিকেশ করবার অবকাশ আমার মনে নেই, আমি থাকি আপনার মন নিয়ে আপনি বিভোর। মানুষের সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বলতে বলতেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। খেই হারিয়ে ফেলি কথার। আমার গোপনতম কে যেন একেবারে নিশ্চুপ হয়ে থাকতে আদেশ করে।'১৯ তবে নজরুল নানাভাবে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন। প্রখ্যাত মার্কসবাদী তাত্ত্বিক আর্নস্ট ফিশার বলেছেন: 'এ বিচ্ছিন্নতা মানুষের প্রগতির জন্য জরুরী, সেই সাথে ক্রমাগত এই বিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করারও প্রয়োজন যাতে মানুষ কাজের প্রতিক্রিয়ায় উত্তরোত্তর আরও অধিক সচেতন হয়ে ওঠে এবং যাতে পুনরায় সে তার নিজের তৈরি নতুন আরেক জগতে নিজেকে স্থাপন করতে পারে যে জগতে সে তার সৃষ্ট বস্তুর দাস হবেনা, হবে প্রভু'।২০ নজরুল যখন বিদ্রোহী, যখন সাম্যবাদী, গজল রচয়িতা প্রতিক্ষেত্রেই তিনি শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছেন। তবে গজল রচনা ছেড়ে তিনি যেমন বিদ্রোহী দ্যোতনায় আর ফিরে আসেন নি তেমনি ইসলামি বন্দনা ছেড়ে আর মার্কসীয় সাম্যের চর্চা করেন নি।

নজরুলের কাব্যভাবনায় ভাবের বিচ্ছিন্নতা কখনো কখনো লক্ষ্য করা যায়। কবি যখন বিদ্রোহী কবিতায় আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস, চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস, আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি, অরণ্য খুনের তরুণ প্রভৃতি মালারূপকের সাহায্যে প্রচণ্ড শক্তিমত্তাকে জ্ঞাপ্ত করেও বলে ফেলেন, 'আমি চিরশিশু, চিরকিশোর' তখনই ঘটে ভাবের বিচ্ছিন্নতা। আবার প্রথম যৌবনে নারীর স্বার্থপরতায় বিম্বুদ্ধ কবি অনেকটা নেতিবাচকভাবে নারী ও নারীত্বের মূল্যায়ন করে লেখেন:

নারী নাহি হতে চায় শুধু একা কারো
এরা দেবী, এরা লোভী, যত পূজা পায় এরা চায় ততো আরো
ইহাদের অভিলোভী মন
একজনে ভুগু নয়, এক পেয়ে সুখী নয়।
যাচে বহু অন।^{২১}

অন্যদিকে বছর তিনেক পরের কাব্য 'সাম্যবাদী'তে নারীত্বের মহিমায় উচ্ছসিত কবি প্রশংসাপ্রলেপ লেপন করে বলেন:

বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।^{২২}

অথবা,

স্রাবের লক্ষী, গানের লক্ষী, শস্য লক্ষী নারী,
সুখমা লক্ষী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।^{২৩}

নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

এক্ষেত্রে সমসাময়িক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দের নারীভাবনার সঙ্গে নজরুলের নারীভাবনায় সাদৃশ্য লক্ষণীয়। জীবনানন্দ তাঁর দ্বিতীয়কাব্য 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র "ক্যাম্পে" কবিতায় নারীকে ঘাই হরিণীর সঙ্গে তুলনা করে নারীর প্রেমে অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। এ কবিতায় হরিণ শিকারে কীভাবে ঘাই হরিণীকে প্রতারণার কাজে ব্যবহার করা হয় তা কবি বর্ণনা করেছেন। ঘাই হরিণীকে বনের মধ্যে বেঁধে রেখে শিকারীরা তার মধ্যে লিবিডোর তাড়না সঞ্চারিত করে। লিবিডোতাড়িত হরিণী পুরুষহরিণের জন্য চিৎকার করতে থাকে। হরিণীর চিৎকার আর আহবানে দলে দলে পুরুষ হরিণ ছুটে আসে। শিকারীরা তখন তাদের গুলি করে হত্যা করে। তারপর মৃত হরিণের মাংস এক সময় খাবারে পরিণত হয়ে খানা টেবিলে ডিসে পরিবেশিত তখনও এই ঘাইহরিণী বেঁচে থাকে। কবি নিজের প্রেমের ক্ষেত্রে এরূপ প্রতারণার বিষয় লক্ষ্য করে বলেছেন:

আমার হৃদয় এক পুরুষ হরিণ
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়-চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চাই নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধুলায় রঙে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি?
জীবনের বিশ্বাসের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে।^{২৪}

তারপর কবি ঘাই হরিণীর প্রেম প্রতারণা যে সর্বত্র রয়েছে সে বিষয়টির পরিব্যাপ্তি বর্ণনা করে বলেছেন :

এই ব্যথা এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে-
কোথাও ফড়িঙে কীটে- মানুষের বুকের ভিতরে
আমাদের সবার জীবনে
বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদের মতো
আমরা সবাই।^{২৫}

অথচ পরবর্তীতে নারীপ্রেমের মাহাত্ম্যকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের পটে স্থাপন করে কবি বলেছেন:

মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিবিদলিষ কী রকম মধুর হতে পারে।^{২৬}

সাহিত্যিকী

এগুলো হচ্ছে উভয় কবির নারীদর্শনের বিচ্ছিন্নতা।

রাজনৈতিক চেতনার পরিসরেও নজরুলের বিচ্ছিন্নতাবোধ ক্রিয়াশীল ছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিত্বের লক্ষ্যে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন নজরুল সহজেই তাঁদের সমর্থক হয়ে উঠেছেন। প্রথম দিকে গান্ধীবাদের সমর্থক, দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদলের (১৯২৩) ভক্ত নজরুল লিখেছিলেন :

- ক. ঘোর
ঘোরেরে ঘোরের আমার সাধের চরকা ঘোর
ঐ স্বরাজ রথের আগমনী ভনি চাকার শব্দে তোর॥
তোর ঘোরার শব্দে ভাই
সদাই জনতে যেন পাই
ঐ খুলল স্বরাজ সিংহদুয়ার আর বিলম্ব নাই।
ঘুরে আসল ভারত ভাগ্য রবি কাটল দুঃখের রাত্রি ঘোর॥^{২৭}
- খ. চরকা চাকায় ঘর্ষ ঘর
ভনি কাহার আসার খবর
ঢেউ-দোলাতে দোলাতে সঙ-সাগররে।^{২৮}

অথচ চরকা ঘুরিয়ে স্বাধীনতার স্বপ্ন কিংবা স্বরাজের অভিলাষ যে বাতুলতা তা উপলব্ধি করার পরপরই তিনি চরকা আর স্বরাজের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন এবং নির্দিধায় লিখে যান:

- ক. বলরে তোরা বল নবীন
চাইনে এসব জ্ঞান প্রবীণ!
স্ব-স্বরূপে দেশকে ক্লীব করছে এরা দিনকে দিন,
চায় না এরা হই স্বাধীন
কর্তা হবার সখ সবারই স্বরাজ ফরাজ দল কেবল,
ফাঁকা প্রেমে ফুস মস্তুর মুখ সবল আর মন গরল।^{২৯}
- খ. ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ চায় দুটো ভাত একটু নুন।^{৩০}
- গ. সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, বসে বসে ফালগুনি,
জাগোরে জোয়ান বাত ধরে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি।^{৩১}

নজরুল-কাব্যে ভাবে ও দর্শনে বিচ্ছিন্নতা ছাড়াও কবির ব্যক্তিগত মননধর্মের বিচ্ছিন্নতাও উদ্ভিন্ন। আমরা জানি যে, বিচ্ছিন্নতা মানুষকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ণ করে দেয়। প্রবল প্রাণশক্তির অধিকারী উচ্ছল ও বল্লাহীন নজরুলের কবিমানসে বিচ্ছিন্নতার কালো থাবা

নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

তাঁর বৈপ্লবিক প্রেরণার প্রচণ্ডগতি নানা কারণে স্বল্পকালের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে এসেছে। লেখাই ছিল তাঁর পেশা। কবিতা-গান-গল্প-উপন্যাস লিখে তিনি জীবিকার্জনের চেষ্টায় ব্যাপৃত হয়ে পড়েন। তাঁর বিপ্লবী উদ্দীপনা ও উল্লাস ১৯২৭-২৮ সালের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে।^{৩২} নজরুল নিজেও একাধিক জায়গায় তাঁর এহেন মানসিকতার প্রসঙ্গ বিবৃত করেছেন। ১৯২৭ সালে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁকে লেখা একটি পত্রে তিনি বলেন: ‘আপনার ১৯২৫ সালের লেখা চিঠির উত্তর দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আয়ু যখন ফুরিয়ে এসেছে তখন। এমনও হতে পারে ১৯২৭ এর সাথে সাথে হয়ত বা আমারও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, তাই আমিও আমার অজ্ঞাতে কোনো অনির্দেশের ইঙ্গিতে আমার শেষ বলা বলে যাচ্ছি আপনার চিঠির উত্তর দেওয়ার সুযোগে’।^{৩৩} ১৯৩০ সালে নজরুলের চার বছরের শিশুপুত্র বুলবুল বসন্ত রোগে মারা যায়। এ সময় তিনি অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন হন। সুশীলকুমার গুপ্ত লিখেছেনঃ ‘শিশুপুত্র বুলবুলের মৃত্যুর পর নজরুল শোকে অভিভূত হয়ে বরদাচরণ মজুমদারের কাছে অধ্যাত্ম উন্নতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করেন এবং ধর্মসাধনায় একাগ্রচিত্ত হন। কোরান- পুরাণ- তন্ত্র উপনিষদ প্রভৃতির অনুশীলন চলতে থাকে। তিনি গেরুয়া পরতে আরম্ভ করেন। এই সময় রচিত তাঁর সাধন সংগীতগুলি গভীর অধ্যাত্ম সাধনার স্বাক্ষর বহন করে।’^{৩৪} এরপর নির্বাক হওয়ার পূর্বপর্যন্ত নানাভাষণ ও রচনায় নজরুল নিজের মানস বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন। ১৩৪৬ সালের ফরিদপুর জেলা ছাত্র সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ১৯৪১ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির রজত জুবিলী উৎসবে সভাপতির ভাষণ, “আমার সুন্দর” প্রবন্ধ প্রভৃতিতে নজরুলের এই নির্লিপ্ত উদাসীন ও একাকীভূত মানস প্রবণতার স্বীকারোক্তি আছে:

ক. আমি বর্তমানে সাহিত্যের সেবা থেকে দেশের সেবা থেকে, কণ্ঠের খেদমতগারি থেকে অবসর গ্রহণ করে সঙ্গীতের প্রশান্ত সাগরদ্বীপে স্বেচ্ছায় নির্বাসনদণ্ড গ্রহণ করেছি। সেই সাধীহীন নির্জন দ্বীপ ঘিরে দিবারাত্রি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে একটানা জলকল্লোল সঙ্গীত। আর সেই শব্দায়মান-সুরউর্মির মুখরতার মাঝে বসে আছি বন্ধুহীন একা। এই বিশ্বজুড়ে যে মহামৌনীর স্তবগান নিঃশব্দ ঝঙ্কারে ধ্বনিত হচ্ছে যদিও আমি সেই ধ্যানীর মৌনমহিমার পূজারী, তবু এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, আমার নির্জনতার বন্ধ জুড়ে শুনেছি অবিরাম বিষাদিত রোদনধ্বনি, শান্তিহীন বিলাপ। মৃত্যুর পরে অশান্ত আত্মা যদি কেঁদে বেড়ায় তার কান্না বুঝি এমনি নীরব, এমনি মর্মভূত। কত বিপুল বিরাট ভিত্তির উপরে আমি আমি আমার ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলাম। কি অপরিণাম আশা, দুর্জয় সাহস নিয়েই না আমি নতুন মানুষের কল্পনা করেছিলাম। আমার সেই ভিত্তিকে জ্বালনা কার অভিশাপে ধরনীতল গ্রাস করেছে, সেই স্বপ্নকে নিষ্ঠুর বতুর জগৎ অভাবের সংসার ভেঙে দিয়েছে। পরাজয় স্বীকার আমি করিনি, কিন্তু ধৈর্যের দুর্গম দুর্গে কতদিন আত্মরক্ষা করব?^{৩৫}

সাহিত্যিকী

- খ. আমার বহু আত্মীয়স্বজন প্রিয় সাহিত্যিক ও কবিবন্ধু আমায় অভিযোগ করেন আমার নাকি দান করার অপরিমেয় শক্তি ছিল দেশকে, জাতিকে, সাহিত্য রস পিপাসু মনকে শুধু কার্পণ্য করে বা স্বার্থপরের মত আপন মুক্তির প্রচেষ্টায় সেই দক্ষিণা দানের দক্ষিণ হস্তকে উর্ধ্বে, না জানা শূণ্যের পানে তুলে ধরেছি। তারা আমায় আত্মীয়ের চেয়েও ভালবাসেন, তারা যখন একথা বলেন, আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়। যে অভিমান তারা আমার উপর করেন, সেই অভিমান জানাই আমি আমার নির্বিকার উদাসীন একাকীত্ব নিয়ে আমার পরম সুন্দরকে। ৩৬

নজরুল তাঁর একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা বা সাহিত্যসৃষ্টির মগ্ন থেকে বিচ্ছিন্নতার জন্য ভক্তপাঠক শ্রোতাদের কাছ থেকে ক্ষমাও চেয়েছেন। 'যদি আর বাঁশি না বাজে আমি কবি বলে বলছি, আমি আপনাদের ভালবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি- আমায় ক্ষমা করবেন- আমায় ভুলে যাবেন। বিশ্বাস করুন আমি কবি হতে আসিনি আমি নেতা হতে আসিনি- আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম- সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম'। ৩৭ সামন্ত অর্থনীতির নাড়িহেঁড়া শোষণ আর পুঁজিবাদের জালবদল পীড়নেই নজরুল বেশি হতাশাদীর্ণ হয়েছিলেন। পুঁজি যেখানে সবসময়ই মানুষকে নিজের চরকায় তেল দিতে শেখায় সেখানে শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতিভার মূল্যায়নে ধনতান্ত্রিক সমাজের কীবা আসে যায়। যারা সংগ্রাম করতে পারে না তারাই জীবন যুদ্ধে ঝরে যায়। নজরুলের অবস্থাও তাই হয়েছিল। সব সময় অভাব বঞ্চনার একটা দাবদাহ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। নজরুলের চিঠিপত্রে তাঁর অর্থই অর্থকষ্টের যন্ত্রণার কথা ছড়িয়ে আছে। ফলে কোথাও একটু শান্তিপূর্ণ নির্ভাবনাময় জীবনের প্রলেপ তিনি পান নি। এর মধ্যে রোগ-শোক অসহযোগিতা-ব্যর্থতার হিসাব তো রয়েছেই। ১৯২১ সালে নার্কিসের সঙ্গে বিবাহ ভেঙে যাওয়া, ২২ সালে ধূমকেতুর প্রকাশ ও বিলুপ্তি, যুগবাণী গ্রন্থের প্রকাশনা নিষিদ্ধ, ইসলামদর্শন পত্রিকায় কাফের ফতোয়া প্রদান, ২৩ সালে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩৯ দিন অনশন, ২৪ সালে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে প্রমীলার সঙ্গে বিবাহ, হৃগলিতে অবস্থান, এখানে প্রথম পুত্র আজাদ কামালের মৃত্যু, বিষের বাঁশী ও ভাঙার গান এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ, ২৫ সালে 'ইন্দ্রপতন' কবিতাকে নিয়ে আবার গোঁড়া মৌলানাদের তীব্র আক্রমণ, ২৬ সালে আইন সভার নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়, ২৭ সালে কৃষ্ণনগরে অবস্থানকালে গুরুতর অসুস্থতা, ২৮ সালে ফজিলাতুল্লাহসার কাছে পত্র লিখন এবং প্রেমে ব্যর্থতা, এ বছরেই মাতৃবিয়োগ, ৩০ সালে পুত্রবিয়োগ, 'প্রলয়শিখা' কাব্যের বাজেয়াপ্তি, ৩১ সালে 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের বাজেয়াপ্তি, ৩৯ সালে কবিপত্নী প্রমীলার পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হওয়া, বাজেয়াপ্ত না হলেও অগ্নিবীণা, ফণিমনসা, সর্বহারা, রুদ্রমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ নিষিদ্ধ করার জন্য সুপারিশ ও পুলিশের হয়রানি, ইসলামদর্শন, শনিবারের চিঠি, মোহাম্মদী প্রভৃতি পত্রিকায় নজরুল কুৎসা ইত্যাদি কারণে নজরুলের সংগ্রামী জীবনের এক

নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

পর্যায়ে হাঁপিয়ে ওঠার পশ্চাতে ছিল। সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে জেল-জুলুম অত্যাচার-কুৎসার শিকার হয়ে একটা মানুষ কতদূর স্থৈর্য প্রদর্শন করতে পারে? কাজেই কবি যখন বলেন:

তুমি শূন্য আমি শূন্য শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।^{৩৮}

তখন সিঁকুর রিক্ততা তাঁর নিজের মধ্যেই জারিত হতে দেখি। নজরুল যখন বলেন:

কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?
কোথা পাব পুষ্পাসব? ধূতুরা গেলাস
ভরিয়া করেছি পান নয়ন নির্যাস!^{৩৯}

তখন বেদনাদগ্ধ দারিদ্র্য স্পষ্ট কবির অসহায়ত্ব প্রতিধ্বনিত হয়। কাজেই বেদনামথিত এ কাকীত্বের বলয়ে আবদ্ধ কবি সহজেই বলতে পারলেন:

তোমাদের পানে চাহিয়া বন্ধু আর আমি জাগিব না।
কোলাহল করি সারা দিনমান কারো ধ্যান ভাঙিব না।
নিচল নিচুপ
আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।^{৪০}

মানুষের প্রতি মমত্বে উৎসলীন কবিও একসময় মানুষের মূঢ়তা থেকে দূরে থাকবার ইঙ্গিত করেছেন:

আজ বলে যাই-এই পৃথিবীতে আর লাগে নাকো ভালো,
হেথা মানুষের নিঃশ্বাসে নিভে যায় যে প্রেমের আলো!^{৪১}

সাহিত্য-সমাজ-বন্ধুত্ব থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ত্রিশের দশকে নজরুল যে নিজস্ব নির্বাসনবলয় তৈরি করেছিলেন তার জন্য কবির অনুশোচনাও কম ছিল না। তাঁর অনুতাপ মৃত্যু চেতনাকে স্পর্শ করেছেন। কবি লিখেছেন:

যে বাণীতে মোর কাহারো প্রাসাদ জানিনা জ্বলেছে কিনা,
আমি জানি শুধু জ্বলিয়াছি আমি, জ্বলেনি বাণী ও বীণা।
জ্যোতিহীন বিষহীন ধূমকেতু আজো হয় বেঁচে আছি,
বিরাত পুরীতে অজ্ঞাতবাসে ফাটুনি ফেরে নাচি।

.....
যে প্রদীপ আলো দানিতে পারে না, কেন তারে আর রাখা,
হে প্রভু এবার মাটির প্রদীপ মাটিতে পুড়ুক ঢাকা!^{৪২}

সাহিত্যিকী

চার.

কাব্য ছাড়াও কথাসাহিত্য ও নাটকে নজরুল বিচ্ছিন্নতার চিত্র অঙ্কন করেছেন। নজরুলের প্রথম উপন্যাস 'বাঁধনহারার' (১৯২৭) নায়ক নূরুল হুদা আত্মীয়হীন, বন্ধনহীন এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। পলায়নপর স্বভাব এই যুবক মাহবুবর সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলে। প্রণয় গড়ায় পরিণয়ের দিকে। কিন্তু বিয়ের দিন তারিখ ঠিক ঠাক হয়ে যাবার পর হঠাৎ করেই নূরুল হুদা যুদ্ধে চলে যায়। এ অপমান সহ্যে না পেরে মাহবুবর বাবা অল্পদিনের মধ্যেই মারা যায়। মা ও মেয়ে আশ্রয় নেয় ভাইয়ের বাড়িতে। শেষে চল্লিশোর্ধ্ব এক জমিদারের সঙ্গে মাহবুবর বিয়ে হয়। অল্প দিনের মধ্যে এই লোকও মারা যায়। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও নূরুল হুদা আর দেশে ফিরে আসেনি। সে যুদ্ধ অফিসে অন্য কাজ নিয়ে থেকে যায়। নূরুল হুদা ছিন্নমূল হয়েই ক্ষান্ত দেয়নি, অন্যের মূলোচ্ছেদনেও তৎপর হয়ে অযথাই বিভ্রম সৃষ্টি করেছে।

নজরুলের গল্পে দেখা যায় ভোগী প্রেমিক ত্যাগের ভান করে যুদ্ধে গেছে। অর্থাৎ প্রেমের চাওয়া পাওয়া চরিতার্থ না হতে দেখে সমাজ থেকে পরিচিত পরিবেশ থেকে নিজেকে ওটিয়ে নিয়ে বিচ্ছিন্নতার পথ ধরে তারা যুদ্ধে গেছে। 'বাঁধনহারার' উপন্যাসের নায়ক নূরুল হুদার মত 'ব্যথার দান' (১৯২২) গ্রন্থের নামগল্পের দারা, "হেনা" গল্পের সোহরাবও যোদ্ধা যুবক। এদের মধ্যে এক ধরনের আত্মনিগ্রহ জন্মাতে দেখা যায়। অপ্রাপ্তি, অবমূল্যায়ন বা অচরিতার্থ প্রেম যখন তৈরি হয়। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহের সুরেশ অচলা প্রত্যাখ্যাত জীবন আর ধরে রাখতে চায়নি বলেই পশ্চিমে কলেরা রোগীর চিকিৎসায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে এবং নিজে একই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। অবশ্যি "ব্যথার দান" গল্পের দারা বোমার আঘাতে দুচক্ষু হারিয়ে বধির হয়ে, "হেনার" সোহরাব যুদ্ধে পাঁচটি গুলি খেয়ে মারাত্মক জখম হয়ে বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের সুযোগ পায় এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে।

ধনতন্ত্র কিভাবে পারিবারিক স্নেহের মূলে আঘাত করে স্বজনবিচ্ছিন্ন করে তার নজির পাই 'রিক্তের বেদন' (১৯২৪) গ্রন্থের 'বাউগেলের আত্মকাহিনী' গল্পে। এখানে পিতার ইচ্ছাপূরণ না হওয়াতে পুত্রকে তেজ্য করে দেয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বাউগেলে পুত্রের সঙ্গে কেবল সখের বশবর্তী হয়ে মা কিশোরী রাবেয়ার বিয়ে দেয়। কিন্তু বালিকা বধুর সঙ্গে বাউগেলের ভালোবাসার স্মৃতি লাভ করার পরপরই রাবেয়া মারা যায়। শোক সামলে ওঠার পর আবার পুত্রকে বিয়ে দেয় তার মাতা। এবার সখিনা নামী স্ত্রীটিকে সে আর ভালোবাসতে

নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

পারে না। অভিমানে সখিনা মৃত্যুবরণ করে। নায়কও ফেল করে পরীক্ষায়। পিতা পুত্রের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে তেজ্যপুত্র করে। নায়ক বাউঙেলে সব কিছু হারিয়ে যুদ্ধে গমন করে। যে সমাজে লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে চাকরি করে সংসারের প্রত্যাশা পূরণের মতো দায়িত্ব থাকে পুত্রের উপরে, সেখানে পিতা-পুত্রের সম্পর্কটা নির্ণয় করে অর্থ বা পুঁজি। এখানে প্রত্যাশা পূরণের সম্ভাবনা নেই দেখে পিতা অকর্মণ্য পুত্রকে পরিত্যাগ করেছে এবং যুদ্ধের মতো একটি মৃত্যুখেলায় সামিল হওয়ার পথ প্রশস্ত করেছে।

নজরুলের 'শিউলি মালা' (১৯৩১) গ্রন্থে "পদ্মগোখরো" গল্পেও দেখা যায় জোহরার মাতৃসন্তার মূল্যায়ন হয়নি। বরং বাবা পীরসাহেব ধনতান্ত্রিক কূটজালের আবরণেই কন্যার বিশ হাজার টাকার অলঙ্কার আত্মসাৎ করে জামাইকে বিষ খাইয়েছে। এখানেই বোঝা যায়, পিতা কীভাবে বাৎসল্য বিচ্ছিন্ন হয়ে কন্যাকে পণ্যে পরিণত করেছে। পুঁজির কাছে সন্তান বাৎসল্য বা স্নেহদাক্ষিণ্যের কোন মূল্য নেই।

'শিউলি মালা' গ্রন্থের "জিনের বাদশা" ও "শিউলি মালা" নাম গল্পে দুটো আলাদা পরিবেশের দুজন আত্মনিমগ্ন বিচ্ছিন্ন মানুষের পরিচয় পাই। "জিনের বাদশা" গল্পের কৃষক সন্তান দুরন্ত আল্লারাখা নারদ শেখের কন্যা চানভানুকে লাভ করবার জন্য জিনের বাদশা, জলদানো কত কী সেজেছে। একদিন নিজেই নিজের বুক ক্ষত করে সাপে কাটার ভান করে রাত্তায় পড়ে থাকে এবং চানভানুর সহানুভূতি ও প্রেম লাভ করে। কিন্তু চানভানুর বিয়ে হলো পূর্বনির্ধারিত পাত্রের সঙ্গে। চানভানুর বিয়ের পরের দিনই আল্লারাখার মধ্যে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। সে পরদিন ভোরে গামছাপরে, নেংটি এঁটে, হাতে পাঁচনী আর কাঁধে লাঙল নিয়ে কৃষক বনে যায়। এ যেন তার আত্মনির্বাসন। প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন করার পর শওকত ওসমানের 'ক্ৰীতদাসের হাসি'র নায়ক তাতারী যেমন হাসতে পারেনি তেমনি আল্লারাখাও চানভানু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে উচ্ছলতা আর দুরন্তপনার সোপান থেকে বিদায় নিয়েছে এবং আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়েছে।

আরেকজন শিক্ষিত অথচ আত্মনিগ্রহের শিকার এক যুবকের সাক্ষ্য পাই 'শিউলি মালা' গ্রন্থের নাম গল্পে। এ গল্পের নায়ক কলকাতার তরুণ ব্যারিস্টার আজহার। শিলং পাহাড়ে অবকাশ যাপনের সময় প্রফেসর চৌধুরী কন্যা শিউলির সঙ্গে তার পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। এত কাছে থেকেও এত আবেগ সত্ত্বেও কখনো কর স্পর্শ করার সাহস এবং প্রবৃত্তি আজহারের হয়নি। বিদায়ের মুহূর্তে শিউলির অশ্রুসজল চোখ তাকে যারপরনাই বেদনাক্রান্ত করে। অবাধ মেলামেশার সুযোগ সত্ত্বেও তারা ভালোবাসার অটুট বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনি। প্রতিবছর আশ্বিনের পয়লা দিনে শিউলির মালা জলে ভাসিয়ে দিয়ে আজহার অচরিতার্থ প্রেমের পূজা করে। আর বেছে নেয় চিরকুমারের জীবন। এটাও একধরনের

সাহিত্যিকী

আত্মনিগ্রহ। প্রেমে সাহস হলো না- বিবাহের জন্য প্রস্তাবের চিন্তা এলো না অথচ চিরকুমারের ব্রত গ্রহণে কোন মানসিক প্রতিবন্ধকতা জন্মালো না আজহারের। রবীন্দ্রনাথের হরিপদ কেরানি বিয়ে করতে পারেনি মধ্যবিত্তের দারিদ্র্যদগ্ধ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে। সেও বেছে নিয়েছিল কিনু গোয়ালার গলির আবর্জনা স্তূপ সন্নিহিত একটি রুগ্ন নির্জন কক্ষ। যার সঙ্গী টিকটিকি আর মাসিদের গ্রামের পরণে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিঁদুর কল্লিত মেয়েটির স্মৃতি। কবি টি.এস. এলিয়টের কবিতার নায়ক জে. আলফ্রেড প্রফ্রক যখন প্রেমে পড়তে চায় তখন মধ্যবিত্ত ওষ্ঠাগত নায়কের প্রত্নুতি ও সাহস, পাছে লোকে কিছু বলে স্বভাব হাস্যকর ঠেকে। বিষ্ণু দেব নায়ক সুরেশ (কথকতা: চোরাবালি) ক্লাস্তিতে হতোদ্যম হয়ে গ্লুকোজ খেতে থাকে। নজরুলের তরুণ ব্যারিস্টার বলেছেনঃ 'আমি শিউলির কাছে হেরে গেলাম। জীবনে আমার সেই প্রথম এবং শেষ হার। আর সেই হারাই আমার গলার হার হয়ে রইল। একটু হাত বাড়ালেই হয়ত তাকে ছুঁতে পারি। এত কাছে থাকে সে। তবু ছুঁতে সাহস হয় না। -- তাই শিউলি ফুলের আশ্বিন যখন আসে- তখন নীরবে মালা গাঁথি আর জলে ভাসিয়ে দিই'।^{৪২} ব্যারিস্টারের এহেন আত্মনিগ্রহতা ও চিরকুমারত্বের ব্রত গ্রহণ করে শিউলি মালা জলে ভাসানো একধরনের আত্মনিগ্রহ। এটাও বিচ্ছিন্নতার নামান্তর।

একজন প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তস্বভাব গ্র্যাজুয়েট পিতার অবিমূশ্যকারিতার পরিচয় পাই নজরুলের 'ঝিলিমিলি' (১৯৩০) নাটকে। মির্জা সাহেব স্বামীত্ব ও পিতৃত্বের মহিমা থেকে বিচ্যুত এক মানুষ। তিনি কত্রীর গান গাওয়া বন্ধ করেছেন। নিজে বি.এ. পাস বলে মেয়েকে বি.এ. পাস ছেলে ছাড়া বিয়ে দেবেন না। রুগ্ন মেয়ে ফিরোজা পাশের বাড়ির হাবিবকে পছন্দ করে বলে পূর্বদিকের জানালা খোলাও নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। হাবিব তার বি.এ. পরীক্ষায় পাসের খরচ নিয়ে এলেও মির্জা সাহেব তাঁর ঘরের দরোজা খোলেননি। প্রত্যাখ্যাত হাবিব চলে গেলে রুগ্ন ফিরোজা হাবিবের 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয় তোমায় আমি চিনি যেন' গান শুনতে শুনতে পরপারে চলে যায়। পুঁজিবাদী মানসিকতা কিংবা সামন্ত স্বভাব শুধু মানুষকে প্রপীড়ক করে তোলে না অনেক সময় বিচ্ছিন্নতার জালা স্যাডিসটিক করেও তোলে। এর ফলে বিচ্ছিন্ন মানুষ নিজে দগ্ধ হয় এবং অন্যকেও দগ্ধ করে। মির্জা সাহেব স্ত্রী, কন্যা ও হাবিবের দুঃখের কারণ। তাঁকেও শেষ পর্যন্ত কন্যাশোকে মুহ্যমান হতে হলো। নজরুলের 'বিজয়া' নাটকেও দেখানো হয়েছে যে পুরুষরা নারীদের পূর্ণ মর্যাদা দেয় না। তাই তারা প্রাণের প্রতিমাকে দেখতে পায়না, মাকেও পায় না। পুরুষ ধনতান্ত্রিক কায়দায় নারীদের শোষণ করে এবং নারীদের মহিমা থেকে ক্রমশ তাদের বিচ্ছিন্ন করে।

পরিশেষে বলবো নজরুলের জীবন ও সাহিত্যে আমরা যে বিচ্ছিন্নতা প্রত্যক্ষ করি তা তাঁর সৃষ্টিকে বহুমাত্রিকতা প্রদান করেছে কিন্তু তাতে প্রাচুর্য ও উত্তরণের ক্ষেত্র প্রসারিত হতে পারেনি। রবীন্দ্র সাহিত্যে বিবর্তন আছে এবং সেটা পূর্বাপর ঐক্যসূত্রে গ্রথিত। কিন্তু

নজরুল-সাহিত্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ

নজরুল-সাহিত্যের বিষয়বৈভব ও প্রবণতাসমূহের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর বিবর্তন মূলত বিচ্ছিন্নতার বাকবদল। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবন থেকে শুরু করে শেষ বয়সেও গল্প লিখেছেন। কৈশোর থেকে শুরু করে মৃত্যুশয্যাতেও কবিতা লিখেছেন। কোন প্রবণতা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হননি বলে তাঁর প্রতিটি সৃষ্টশাখায় ক্রমবিকাশ ঘটেছে। কিন্তু নজরুল ইসলাম যেটা একবার ছেড়েছেন সেটাতে আর নিমগ্ন হতে পারেন নি। প্রথম সাহিত্য জীবনের দশ-এগার বছর গল্প-কবিতা-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ লিখলেন। পরের এগার বছর ওসবের প্রতি আর আগ্রহ দেখালেন না। ফলে ভক্ত পাঠকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন বারবার। ত্রিশোত্তরের আরেক কবির ভাগ্যেও জুটেছিলো কাব্যিক বন্ধ্যাত্বের জ্বালা। তিনি কবি সমর সেন। ১৯৪৬ সালের পর তিনি আর কাব্যচর্চা করেননি। কাজেই নজরুল যে শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, পুঁজিবাদের দৌরাণ্যে অপসৃত হয়ে তা যদি বাস্তবে রূপ নিতো তাহলে তিনি সাহিত্যচর্চার শান্ত, স্থিতধী পরিবেশ পেতেন। তাঁকে অভাব-বঞ্চনার দৃষ্টা ছোবলে ক্ষতবিক্ষত হতে হতো না। হয়তো জীবনের শেষ অবধি সাহিত্যের পরিসরে কলম চালিয়ে যেতে সক্ষম হতেন।

তথ্য নির্দেশ

১. কার্লমার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, 'কমিউনিস্ট পার্টি'র ইশতেহার', নির্বাচিত রচনাবলি, ১ম খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯, পৃ. ১৪৫।
২. তদেব, পৃ. ৮০।
৩. বিশ্ববরেণ্য শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ডার্কিনিয়া উলফ, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, মায়াকোভস্কি, জন বেরিয়ান, সিলভিয়াপ্লাথ প্রমুখ।
৪. স্বৈচ্ছায় দেশত্যাগী জেমস জয়েস, এজরা পাউণ্ড, হেনরি জেমস, টি. এস. এলিয়ট প্রমুখ। অন্যদিকে ফ্রেদরিকো গার্সিয়া লোরকা, নবোকফ প্রমুখ সাহিত্যিক অনিচ্ছায় নির্বাসিত হয়েছেন।
৫. বিষ্ণু দে, "সোহবিভেওআদেকাকী বিভেতি", 'উর্বশী ও আর্টেমিস: কবিতা সমগ্র, ১ম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৪২।
৬. জীবনানন্দ দাশ, "বোধ", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'; দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (স.) জীবনানন্দের কাব্য সংগ্রহ, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ১১১।
৭. তদেব, পৃ. ১১৪।
৮. জীবনানন্দ দাশ, "রাত্রি", জীবনানন্দের কাব্য সংগ্রহ, পৃ. ২৬৭।
৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্র রচনাবলী, ২০শ খণ্ড, পু.মু., বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৩, পৃ. ৩৯০।
১০. কাজী নজরুল ইসলাম, "চোর ডাকাড", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২৩৯।

সাহিত্যিকী

১১. এ. "শোধ করো স্বপ্ন", 'শেষ সওগাত', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩২২।
১২. এ. "চোর ডাকাড", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৯।
১৩. এ. "রাজা-প্রজা", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৫।
১৪. এ. "ধীবরদের গান", 'সর্বহারা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫।
১৫. এ. "আতের বজ্রাতি", 'বিষের বাঁশী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৬।
১৬. এ. "অশ্বিনীকুমার", 'ফণিমনসা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৬।
১৭. তদেব, পৃ. ৩১৭।
১৮. কাজী নজরুল ইসলাম, "যা শত্রু পরে পরে", 'ফণিমনসা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪।
১৯. এ নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৩৭৭-৭৮।
২০. আনিসুজ্জামান, 'শিল্প-সাহিত্য-পুঁজিবাদ' (শাহাদুজ্জামান অনূদিত), চর্যা প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৮৮, পৃ. ৪৭।
২১. কাজী নজরুল ইসলাম, "পুজারিণী", 'দোলন চাঁপা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭২।
২২. এ. "নারী", 'সাম্যবাদী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১।
২৩. তদেব।
২৪. জীবনানন্দ দাশ, "ক্যাম্পে", 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', জীবনানন্দের কাব্যসমগ্র, পৃ. ১২২।
২৫. তদেব, পৃ. ১২৩।
২৬. জীবনানন্দ দাশ "তোমাকে", 'বেলা অবেলা কালবেলা', জীবনানন্দের কাব্যসমগ্র, পৃ. ৪০৬।
২৭. কাজী নজরুল ইসলাম, "চরকার গান", 'বিষের বাঁশী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৪-১৫।
২৮. এ. "বাংলায় মহাজ্ঞা", 'ফণিমনসা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৫।
২৯. এ. "বিত্রোহীর বাণী", 'বিষের বাঁশী', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪।
৩০. এ. "আমার কৈফিয়ৎ", 'সর্বহারা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৪।
৩১. এ. "সব্যসাচী", 'ফণিমনসা', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০৪।
৩২. আতাউর রহমান, 'নজরুল কাব্য সমীক্ষা', ৩য় সং, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ. ১০৪।
৩৩. দ্র. নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৯২।
৩৪. সুশীলকুমার গুপ্ত, 'নজরুল চরিতমানস', ২য় দেজ সং, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ৯৭।
৩৫. কাজী নজরুল ইসলাম, "বাংলার মুসলিমকে বাঁচাও", নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১০৬।
৩৬. এ. "যদি আর বাঁশি না বাজে", নজরুল রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১২৫।
৩৭. তদেব পৃ. ১২৭।
৩৮. কাজী নজরুল ইসলাম, "সিদ্ধু ৩য় তরঙ্গ", 'সিদ্ধু হিন্দোল', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯।
৩৯. এ. "দারিদ্র্য", 'সিদ্ধু-হিন্দোল', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬০।
৪০. এ. "বাতায়ন পাশে শুবাক তরঙ্গ সারি", 'চক্রবাক', নজরুল রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৬।
৪১. এ. "আত্মগত", 'শেষ সওগাত', নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১।
৪২. এ. "মৃত তারা", নজরুল রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫১।
৪৩. এ. "শিউলিমালা", 'শিউলিমালা', নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬৭।